পাহাড়ী ময়নার অট্টহাসি

অদ্রীশ বর্ধন

ফুটবল গ্রাউন্ডের মতো মস্ত ছাদ। মার্বেল প্রাসাদের ছাদ। সারা মুখে বয়সের চিহ্ন আঁকা এক বৃদ্ধ হনহন করে যাচ্ছেন ছাদের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে, আবার ফিরে আসছেন সেই প্রান্ত থেকে এই প্রান্তে। বিকেলের পড়ন্ত আলোয় দেখা যাচ্ছে তাঁর দুই চোখের তারা সাদা হয়ে এসেছে ছানি পড়ায়। কিন্তু ঘষা কাচের মতো ওই কনীনিকার আড়ালে বুঝি এখনও স্ফুলিঙ্গ দেখা যাচ্ছে। ওঁর গালের চামড়া ঝুলে পড়েছে, তাই নাকখানা যেন আরও একটু বাঁকানো তোতাপাখির মতো ঠিকরে এগিয়ে রয়েছে। দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় পিছন দিকে। ওঁর প্রতি পদক্ষেপে বিদ্যুৎ ঝলকিত হচ্ছে যেন। বয়োবৃদ্ধ বলে মনেই হয় না। অন্তরের অন্তস্তল থেকে তেজ উৎসারিত হয়েই চলেছে অনুক্ষণ 'লেসারের' মতো। পদক্ষেপে এই যে সর্পিল ক্ষিপ্রতা, গোটা অবয়বের মধ্যে এই যে চিতাবাঘের চমক—এই ঝলক ছিল ওঁর যৌবনে। রয়েছে এখনও।

উনি একসময়ে বঙ্গের বিস্ময় ছিলেন। তখন ছিল ব্রিটিশ আমল। স্বাধীনতা যুদ্ধের ডঙ্কা বেজে চলেছে দেশময়। উনি সেই সময় গৃহ ছাড়েন, স্বজন ছাড়েন, গোপন অভিযানে সাগরে ভাসেন। অথচ ওঁর নাম স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কুলজিতে নেই। উনি তাম্রফলক পাননি, পেনশনও পান না। ওঁর নাম বলেন্দ্র। গোটা জীবনটাই রণক্ষেত্র।

রোমাঞ্চকর সেই গুপ্ত অভিযানের পটভূমিকাতেই রচিত হচ্ছে আশ্চর্য এই গোয়েন্দা কাহিনি—যে কাহিনি-নায়কের পর্দা সরিয়ে উন্মোচন ঘটিয়েছে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ডিটেকটিভ—ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

বিশাল এই ছাদের উত্তর-পশ্চিম দিকে রয়েছে মার্বেল পাথরের মস্ত ঠাকুরঘর। পুরো পশ্চিমদিকে পরপর পাঁচখানা বড় ঘর। প্রথম ঘরটির মধ্যে বসে ইন্দ্রনাথ রুদ্র পলকহীন চোখে দেখছিল বৃদ্ধ বলেন্দ্রর ক্ষিপ্র এবং দৃপ্ত পায়চারি।

বেশ কিছুক্ষণ দেখবার পর বড় নিঃশ্বাস ছেড়ে বললে পাশের প্রৌঢ় পুরুষকে, 'ঠিকই বলেছেন, উনি পাগল নন। যেন খাঁচায় পোরা বাঘ।'

প্রৌঢ় বললে, 'অসম্ভব মনের জোর। চুলে পাক ধরে গেল, এখনও ভয় পাই। বাবার চোখের সামনে দাঁড়ানো যায় না।'

'খুব রাগী?'

'ছিলেন। এখন বিশেষ কথা বলেন না। প্রায় মৌনী।'

'তাহলে ওই কথাগুলো শুনলেন কিভাবে?'

হাসল প্রৌঢ়। বিলক্ষণ বলিষ্ঠ পুরুষ। পিতার মতোই খর্বকায়। কিন্তু শীর্ণকায় নয়। যেন এক পরিচ্ছন্ন বনমানুষ। শ্রীঅঙ্গ লোমশ নয় বটে, কিন্তু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, কপাল, হনু, গাত্রবর্ণ মানুষের এই পূর্বপুরুষকে স্মরণ করিয়ে দেয়। হাসির মধ্যে সেই স্মৃতিকথা। বড় বড় দাঁত।

বললে, 'আড়ি পেতে শুনেছি ঠাকুরঘরে। যখন ধ্যানে বসেন, তখন সমাধিস্থ হন কিনা বলতে পারব না—তবে মুখের আগল খুলে যায়। প্রায় অচৈতন্য হয়ে যান।'

'স্বকর্ণে শুনতে চাই। কখন বসবেন ধ্যানে?'

'সূর্য ডুবলেই।'

মস্ত ছাদের ওপর ঘরের জানলা থেকেই দেখা গেল, সূর্যদেব তাঁর রথ নিয়ে চলে গেলেন পশ্চিমে।

আলো জ্বলে উঠল ঠাকুরঘরে। ভেতরে সাদা পাথরের বিগ্রহের সামনে সাদা পাথরের মূর্তির মতো বসে আছেন সেই বৃদ্ধ। খালি গায়ে। কঙ্কালসার শরীর। কিন্তু যেন অদৃশ্য বিকিরণ ঘিরে রয়েছে তেজোদৃপ্ত শীর্ণতনু।

জানলার সামনে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ইন্দ্রনাথ আর সেই বলিষ্ঠ প্রৌঢ়।

ক্ষণপরেই শুরু হলো মন্ত্রোচ্চারণের

মতো শুধু স্বগতোক্তি। প্রৌঢ় পুত্র এতকাল মন্ত্রোচ্চারণ ভেবেই কর্ণপাত করেনি। অকস্মাৎ একদিন দু'একটা শব্দ কানে বাজতেই খটকা লেগেছিল। ইন্দ্রনাথের শরণ নেওয়া হয়েছে ওই কারণেই। ইন্দ্রনাথও ছুটে এসেছে অনুদ্ঘাটিত অতীত রহস্যের টানে।

কথাগুলো বাস্তবিকই অদ্ভুত।

'ময়না...ও ময়না...তুই পাহাড়ী ময়না...কিন্তু তোর অট্টহাসি দেয় কিসের ঠিকানা?...সোনার সিংহাসনের...দশ কেজি ওজন তো বটেই...তুলতে পারিনি ...কেউ পারবেও না...সেই গোপন গুহার ঠিকানা কেউ পাবে না...সেখানে পাহারা দিচ্ছে সাপ ঈগল...ছদ্মবেশী সাপ... পেঙ্গুইন...লেদারব্যাক কচ্ছপগুলো পথ না দেখালে ঠিকানা কি পেতাম? ...মনে হয়েছিল যেন নিয়ানডারথালল্যান্ডে পৌঁছেছি...গন্ডোয়ানাল্যান্ডের দৃশ্য দেখছি ...অদ্ভুত সুন্দর...ভয়ঙ্কর সুন্দর ...সোনার সিংহাসন!'

স্বগতোক্তি ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে এল আস্তে আস্তে। এখন অখণ্ড নীরবতা বিরাজ করছে ঠাকুরঘরে।

সরে এসে বসবার ঘরে বসে ইন্দ্রনাথ বললে, 'উনি এখন সাউন্ড অফ সাইলেন্স শুনতে পাচ্ছেন।'

লুব্ধ চোখ দুটো প্রায় কপালে তুলে বললে প্রৌঢ়, 'সাউন্ড অফ সাইলেন্স! নৈঃশব্দের শব্দ! হয় নাকি?'

'হয়। হিমালয়ে নির্জন অঞ্চলে গেলে শুনতে পাবেন। মনের গভীরে ডুব দিলে শুনতে পাবেন। ব্রহ্মাণ্ড বিস্তারের সেই নিঃশব্দ শব্দকেই মহামন্ত্র বলেছেন বিবেকানন্দ।'

অস্থির গলায় বললে প্রৌঢ়, 'কিন্তু ওই সোনার সিংহাসন...কোথায় আছে?'

পলকহীন চোখে লোভাতুর মুখটা নিরীক্ষণ করতে করতে খুব আস্তে বললে ইন্দ্রনাথ, 'আমি জেনে ফেলেছি কোথায় আছে।'

চেয়ার ছেড়ে প্রায় লাফিয়ে উঠল প্রৌঢ়, 'বলুন না...বলুন প্লিজ...কিন্তু জানলেন কি করে? ম্যাজিক জানেন নাকি?'

আকাঁপা গলায় ইন্দ্রনাথ শুধু বললে, 'না। তবে কিছু খবর রাখি। সোনার সিংহাসনের ঠিকানা রয়েছে ওঁর স্বগতোক্তির মধ্যেই। সারা জীবন ধরে যা গোপনে রেখেছেন, তা গোপনেই থাকুক না। কিন্তু ওঁর সঙ্গে কথা বলে একটু শান্তি পেতে চাই।'

শুধু হতাশই হলো না প্রৌঢ়, একটু রুক্ষও বটে। কর্কশ স্বর গোপন করার চেষ্টাও করলে না। এতক্ষণ যা ছিল মিঠে, এখন তা ঈষৎ কড়া, 'লাভ কী?'

দুই চোখে কমল হিরের ঝিলিক তুলে ইন্দ্রনাথ শুধু বলেছিল, 'লাভ এই দেশের। লাভ ওঁর উত্তরপুরুষের...লাভ বর্তমান প্রজন্মের। আমি রহস্যসন্ধানী, সোনাসন্ধানী নই। ওঁর রহস্যময় অতীতের ভেতরে যখন উঁকি দিতে পেরেছি—'

গম্ভীর বজ্রকণ্ঠে ধ্বনিত হলো দোরগোড়ায়, 'মিথ্যে কথা! ধাপ্পা! আমার অতীত খানিকটা ধোঁয়া—'

মুখ ফিরিয়ে অবিচলিত স্বরে ইন্দ্রনাথ বললে, 'কিন্তু আমি যে দেখে ফেলেছি ধোঁয়ার আড়ালের সেই দ্বীপ।'

'দ্বীপ?' যেন চাবুক খেলেন অশীতিপর বৃদ্ধ।

'হনুমান যদি হতেন, লাফিয়ে এক দ্বীপ থেকে সেই দ্বীপে পৌঁছতে পারতেন। ল্যাটিচিউড নাইন ডিগ্রি, লঙ্গিচিউড নাইনটি থ্রি ডিগ্রি...গেলেন কি করে?'

স্ফুলিঙ্গ দেখা দিল ক্ষীণবপু বৃদ্ধের শ্বেত মণিকায়, 'জানলেন কি করে?'

'পাহাড়ী ময়নার অট্টহাসি যে আমিও শুনেছি, দেখেছি লক্ষ্মণ সৈকতের শোভা।'

'চুপ! চুপ!' বৃদ্ধের চোখ ঘুরে গেছে প্রৌঢ় পুত্রের দিকে, 'ওকে বলতে চাই না। কিন্তু আপনার কাছে মন হাল্কা করতে চাই। কে আপনি?'

'আমি সে, যে চায় অজানাকে জানতে—আপনার মতোই। নিশানা পেলেন কিভাবে?'

'পাহাড়ী ময়নার অট্টহাসির পথ দিয়ে চলে। সে এক আশ্চর্য পথ। রাশি রাশি ডিম ছড়িয়ে সেখানে। সারা বছর তারা সাত সমুদ্রে কাটায়, কিন্তু একবার আসে ওইখানে শুধু ডিম পাড়তে। সেইখানে ...সেইখানে আছে সোনার সিংহাসন। অথচ সে খোঁড়া—যার সিংহাসন, সে খোঁড়া!'

উঠে দাঁড়াল ইন্দ্রনাথ, 'চলুন আমার বাড়ি, সেখানে শুনব আপনার আশ্চর্য অ্যাডভেঞ্চার। কিন্তু এখানে নয়। যাবেন?'

'হ্যাঁ, যাব।'

অসম্ভবের অভিযানে গেছিলেন রণেন্দ্র। অত্যাচারী ব্রিটিশের সঙ্গে অহিংস যুদ্ধে নারাজ ছিলেন। দার্জিলিং যাচ্ছিলেন সন্ত্রাসবাদের কাগজপত্র নিয়ে। ফার্স্ট ক্লাস কামরায় ভেবেছিলেন একা আছেন। ট্রেন যখন ফুল স্পিডে, টয়লেট থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে এসেছিলেন এক ইংরেজ আর্মি অফিসার। টলছিলেন সুরার নেশায়। হুঙ্কার ছেড়েছিলেন রণেন্দ্রকে দেখে, 'ইউ ব্ল্যাক নেটিভ, গেট আউট!'

ট্রেন তখন ছুটছে। সঙ্গে ফার্স্ট ক্লাস টিকিট রয়েছে। রণেন্দ্র নামবেন কেন? ছোরা নিয়ে মারতে এসেছিলেন মত্ত অফিসার। সেই ছোরা কেড়ে নিয়ে তাঁকে পর-পর সাতবার মেরেছিলেন রণেন্দ্র। শেষ অবস্থায় অ্যালার্ম চেন ধরে ঝুলে পড়েছিলেন গোরা। ট্রেন যখন দাঁড়িয়ে গেল, রণেন্দ্র তখন পালাননি। রক্তমাখা ধুতি-পাঞ্জাবি পরেই দরজা খুলে দিয়েছিলেন গার্ডকে। তারপর হয়েছিল বিচারের প্রহসন। ফাঁসির হুকুম। কিন্তু দেশপ্রেমিক বাঙালী ব্যারিস্টাররা তা হতে দেননি। ফুলের মালা গলায় নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন রণেন্দ্র। কিন্তু জেলের মার তাঁর মাথা খারাপ করে দিয়েছিল। সেইসঙ্গে অষ্টপ্রহর পুলিশ চর ঘুরছে পেছনে।

অতএব একদিন উধাও হয়ে গেলেন অকুতোভয় মানুষটা। চলে গেলেন...

এইখানে তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিল ইন্দ্রনাথ, 'চলে গেলেন সুদূর সিংহলে। সেখান থেকে সবচেয়ে কাছের দ্বীপ নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। গেলেন কি করে?'

অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থেকে বৃদ্ধ শুধিয়েছিলেন, 'যে ভাবেই যাই না কেন—গাছের গুঁড়ি জড়িয়ে ধরে কালাপানি

শক্তিচেবির সমুদ্র থেকে ভেসে গেছি গভীর সমুদ্রে—ও সব আমার কাছে কিছু নয়। কিন্তু আপনি জানলেন কি করে আমি গেছিলাম নিকোবরে?'

'ধ্যানস্থ হয়ে সাউন্ড অফ সাইলেন্স শোনবার ঠিক আগে আপনি অজ্ঞাতসারে যে জিনিসগুলোর কথা বলে যান, তা যে আছে শুধু গ্রেট নিকোবরেই। লেদারব্যাক কচ্ছপরা সাত সমুদ্র টহল দিয়ে বছরে একবার তো ওখানেই আসে ডিম পাড়তে। আগে বলুন, কেন গেলেন আপনি?'

অমনি বৃদ্ধ রণেন্দ্রর চোখে ঝলসে উঠল সেই দীপ্তি, মনে হতে পারে উন্মাদের চাহনি, কিন্তু তা নয়...তা নয়। গভীর গোপন অনেক কিছু যেন অকস্মাৎ ফুঁড়ে করে আত্মপ্রকাশ করতে চাইছে সেই চাহনির মধ্যে দিয়ে।

বলেছিলেন আবেগরুদ্ধ স্বরে, 'দেশের জন্য...দেশের জন্যে...এক ওলন্দাজ নাবিকের মুখে শুনেছিলাম খিদিরপুর ডকে দাঁড়িয়ে এক স্বর্ণভাণ্ডার নাকি লুকোনো আছে গ্রেট নিকোবরে। আমি সেই ভাণ্ডার লুঠ করে বেচে দিয়ে কিনতাম রাশি রাশি অস্ত্র, অত্যাচারী ইংরেজদের কলজেগুলো ফুটো করবার জন্যে—'

'কিন্তু সেই স্বর্ণভাণ্ডার আবিষ্কার করেও ফেলে দিয়ে চলে এলেন কেন?'

নিবিড় চোখে চেয়ে রইলেন রণেন্দ্র। তারপর বললেন বাতাসের মতো স্বরে, 'ঘোড়া মানুষটার সিংহাসন বেচবার ইচ্ছে হলো না বলে।'

'খুঁজে পেলেন পাহাড়ী ময়নার অট্টহাসি শুনে?'

'হ্যাঁ। সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। অবাক হই আজও। হঠাৎ আমার ওপর এত সদয় হলো কেন পাহাড়ী ময়না? কেন অট্টহেসে পথ দেখিয়ে দেখিয়ে নিয়ে গেল স্বর্ণভাণ্ডারের গোপন গুহায়? ওরা শুধু বিদ্রূপের হাসি হেসে গেছে—এক গাছ থেকে আর এক গাছের মাথায়। আমি অশরীরীর মতো হেঁটে হেঁটে গেছি সেই গাছগুলোর তলা দিয়ে। ওখানকার অত্যন্ত আদিম জংলীরাও আমাকে দেখে সরে গেছে।'

'শোম্পেন জাতের নাম? মঙ্গোলয়েড উপজাতি, পরনে শুধু গাছের বাকল?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। যাযাবর। কিন্তু আমাকে ওদের একজন বলেই ধরে নিয়েছিল। পথ ছেড়ে দিয়েছিল। তারপর...তারপর...'

'আমাকে নিয়ে যাবেন?'

জুলজুল করে চেয়ে রইলেন বৃদ্ধ রণেন্দ্র, 'সোনার লোভে?'

'না।' ধীর গম্ভীর গলা ইন্দ্রনাথের, 'ঘোড়া মালিককে হয়তো চিনি আমি, কিন্তু তাঁর সিংহাসন ওখানে যাবে কেন?'

'কে সে? কে সে?' হাঁপাচ্ছেন রণেন্দ্র।

'আগে নিয়ে চলুন, তারপর বলব।'

'ব্যবস্থা করুন।'

আন্দামান অ্যান্ড নিকোবর অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের দৌলতে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের একটা রেস্ট হাউস পেয়ে গেছিল ইন্দ্রনাথ। সঙ্গে শুধু বৃদ্ধ রণেন্দ্র, আর কেউ নয়। স্বর্ণলোভী প্রৌঢ় পুত্রকে সঙ্গে আনেননি উনি।

তখন শীতকাল। সূর্যোদয় ঘটল ঠিক ভোর পাঁচটায়। কপাল ভাল, আকাশ পরিষ্কার ছিল বলে সূর্যরশ্মির অলৌকিক খেলা দেখতে পেয়েছিল ইন্দ্রনাথ। সে এক গা-ছমছমে দৃশ্য। নিচু জমি আর উঁচু পাহাড়ের বিশাল মহীরুহদের মাথায় মাথায় সে এক অত্যাশ্চর্য অবর্ণনীয় রশ্মিক্রীড়া। এক-একটা গাছ প্রায় দেড়শ ফুট জায়গা জুড়ে মাথা চাড়া দিয়েছে ওপরে দেড়শ-দুশ ফুট উঁচুতে। ঘন চাঁদোয়ায় লুকিয়ে থেকে কিচিরমিচির করেই চলেছে হাজারো পাখি। কেউ কেউ ডানা ঝটপটিয়ে বর্ণবাহার দেখিয়ে যাচ্ছে সামনে দিয়ে—এই সব প্রজাতির পাখি এই গ্রেট নিকোবর ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। লম্বা ল্যাজ ড্রোঙ্গো, বিষম গলাবাজ গ্রেট আন্দামান কাকাতুয়া, সুকণ্ঠ ইম্পিরিয়াল পায়রা, বকমবাজ এমারাল্ড ঘুঘু—আরও কত কী। কিন্তু এসবে তন্ময় হয়ে থাকতে পারেননি রণেন্দ্র। তাঁর পায়ে যেন চাকা ঘুরছে। নিঃশব্দ-সঞ্চারী সাপ ঈগলরা অবাক হয়ে তাঁর মাথার ওপর টহল দিয়ে গেছে। পথ ছেড়ে সরে গেছে ছদ্মবেশী সাপ, দূর থেকে উঁকি দিচ্ছে মঙ্গোলয়েড বনবাসীরা।

রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করেছিল ইন্দ্রনাথ, 'লেদারব্যাক কচ্ছপরা তো বেরবে সন্ধ্যা হলে—'

'হাজারে হাজারে ভেসে আসবে। বড় হিসেবী, বড় সাবধানী। তাই তো পেলাম সোনার সিংহাসনের ঠিকানা—ওদেরই দৌলতে।'

ওরা আসে সন্ধ্যার পর। জোয়ারের জল যখন ফুলতে থাকে, তখন। আসে প্রশান্ত মহাসাগর আর ভারত মহাসাগর থেকে। অন্য মহাসাগর থেকেও। প্রায় চারশ কিলোগ্রাম ওজনের অতিকায় মেয়ে-কচ্ছপরা বড় হুঁশিয়ার। জোয়ারের জল যখন ফুলে উঠে গিরিগহ্বরে ঢুকে যায়, ওরা চলে যায় সেই সব সুড়ঙ্গ দিয়ে দ্বীপের পাতাল প্রদেশে। ডিম পেড়ে দিয়ে ফিরে যায় গভীর সমুদ্রে। ডিম ফুটে বাচ্চারা বেরিয়ে গুটি গুটি চলে আসে জলের ধারে—নিজেরাই।

লক্ষ্মণ সৈকতে পৌঁছে রণেন্দ্র হনহনিয়ে চলে গেলেন উঁচুনিচু পাহাড় টপকে একটা দুর্গম অঞ্চলে। সেখানে বালির ওপর রয়েছে খুদে কচ্ছপদের পায়ের ছাপ। সেই ছাপ অনুসরণ করে ঢুকলেন একটা গহ্বরে। এখন জোয়ারের জল সরে গেছে, তাই সুড়ঙ্গের মুখ বেরিয়ে পড়েছে। ধারে ধারে জলের মধ্যে দেখা যাচ্ছে ফ্যানটাসটিক রঙের প্রবাল জঙ্গল।

রণেন্দ্রর কিন্তু কোনও দিকে দৃষ্টি নেই। জল নেমে যাচ্ছে হিসহিস শব্দ তুলে, উনি ঢুকে যাচ্ছেন সুড়ঙ্গের গভীরে। হাতের টর্চ জ্বালিয়ে নিয়েছিল ইন্দ্রনাথ। রণেন্দ্র সঙ্গে না থাকলে সুড়ঙ্গের গোলকধাঁধায় পথ হারাত নির্ঘাৎ—আলোও নিশানা দিতে পারত না। কিন্তু রণেন্দ্র চলেছেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো যেন এক অদৃশ্য সুতোর আকর্ষণে।

এসে গেল একটা পাথরের প্রকোষ্ঠ। নিঃসীম অন্ধকার চমকে চমকে উঠছে টর্চের আলোয়। একধারে রয়েছে একটা মার্বেল পাথরের শবাধার।

পুরো প্রকোষ্ঠটা জলের জোয়ার লেভেলের অনেক উঁচুতে। অথচ মাথার ওপর রয়েছে পাথরের এবড়োখেবড়ো ছাদ—যে ছাদ ধরে রেখে দিয়েছে গ্রেট

নিকোবরের অরণ্য অঞ্চলকে। অত বড় বড় গাছের শেকড়গুলোও পাথর ফাটিয়ে ভেতরে ঢোকেনি—এটাই আশ্চর্য।

পাথরের শবাধারের সামনে রয়েছে একটা ভাঙাচোরা কাঠের ফার্নিচার। পালঙ্ক নিশ্চয়। পায়াগুলো হাতির দাঁতের, তার ওপর সোনার কাজ।

পাথরের শবাধারের ওপর রয়েছে এক পুরুষসিংহের শৌর্যবীর্যের নিদর্শন—তাঁর তরবারি হাতির দাঁতের খাপে ভরা, তাঁর লোহার ঢাল, স্যান্ডাল, লেগগার্ড, মাথার হেলমেট।

এর পাশেই রয়েছে সোনার সিংহাসন। নিরেট সোনা। চারটে পায়ার মধ্যে সেট করা একটা নিরেট সোনার বাক্স।

টর্চ ফোকাস করে পেটিকার ডালায় খোদাই করা রাজপ্রতীকের দিকে অনেকক্ষণ চেয়েছিল ইন্দ্রনাথ।

মৃদু হাসি ভেসে উঠেছিল ঠোঁটের কোণে।

রণেন্দ্র হাঁফাচ্ছিলেন। বললেন, 'চিনতে পেরেছেন মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ। মানুষটা নাকি খোঁড়া আপনি বলেছিলেন। কি করে জানলেন?'

'এই তো, এই লেগগার্ড দুটো দেখুন। বুঝলেন?'

আর বলতে হয়নি। দুটো লেগগার্ড সমান মাপের নয়—একটা আর একটার চাইতে একটু ছোট। যার মানে অধিকারীর একটা পা আর একটা পায়ের চাইতে ছিল একটু ছোট।

মানুষটা ছিলেন খঞ্জ!

আস্তে বলেছিল ইন্দ্রনাথ, 'পেটিকার মধ্যে কি আছে দেখে গেছিলেন?'

'হ্যাঁ। আপনিও দেখুন!' বলেই সোনার কবজা লাগানো ঢাকনা তুলে ধরেছিলেন রণেন্দ্র।

রামধনু-রঙিন ঝলক ঠিকরে এসেছিল ভেতর থেকে। টর্চের আলোয় দেখা যাচ্ছে রশ্মি-উৎস।

রকমারি সাইজের অজস্র রত্ন ঝলমল করছে ভেতরে। সবার ওপরে রয়েছে একটা ভাঙা করোটি।

যেন এই সম্পদের যক্ষ।

চোখের পাতা না কাঁপিয়ে সেদিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকবার পরে খুব আস্তে

বলেছিল ইন্দ্রনাথ, 'আশ্চর্য!'

'কী আশ্চর্য, ইন্দ্রনাথবাবু?'

'এইসব। থাকার কথা তো অন্য জায়গায়। আজও সেখানে আছে বলেই জানতাম। পাওয়া গেছিল পাতালগর্ভের কবরখানায়। কিন্তু তা কি জাল? না, এই যা দেখছি, এ সব জাল? আসল কোনটা?'

'মানে?' উত্তেজনায় কাঁপছেন রণেন্দ্র।

'তার চেয়েও বড় কথা', উত্তর না দিয়ে বলে গেছিল ইন্দ্রনাথ, 'এসব এখানে কেন? ইউরোপের জিনিস এশিয়ায় কেন? এই বিজন দ্বীপে পাতালের সুড়ঙ্গে কেন? এ তো মস্ত হেঁয়ালি! বোম্বেটেদের কারসাজি, না অন্য কিছু?'

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, ইন্দ্রনাথবাবু।'

'গুরুদেব আপনি। আপনাকে আমি কি বোঝাবো? এই যে হেলমেট দেখছেন, লোহার হেলমেট, এ হেলমেট তৈরি হওয়ার কথা ম্যাসিডোনিয়ার প্রথম লোহা দিয়ে। এবার বুঝেছেন কার কথা বলছি? ম্যাসিডোনিয়ান সাম্রাজ্যের পত্তন যিনি করেছিলেন—তাঁর। আলেকজান্ডারের বাবা ফিলিপ-এর। রাজপ্রতীক তো ম্যাসিডোনিয়ার। এখানে এল কেন? ডুপ্লিকেট নাকি? কিন্তু হিরে-জহরৎ? এই স্বর্ণ সিংহাসন? এসব তো মেকি নয়!'

'রহস্য!' এতক্ষণ পরে যেন নিজের স্বাভাবিক গম্ভীর স্বর ফিরে পেলেন রণেন্দ্র। 'এই করোটি-যক্ষই ফিরিয়ে দিয়েছিল আমাকে—মুখে চাবি দিয়ে রেখেছে এত বছর ধরে। ইন্দ্রনাথবাবু, দোহাই আপনার, এ রহস্য ভেদ করতে যাবেন না।'

করেনি ইন্দ্রনাথ।

কিন্তু ভাবে আজও। করোটিটা আসলে কার? এ কোন যক্ষপতির রত্নপুরী দেখে এল সে গ্রেট নিকোবরের পাতাল প্রদেশের তমাল-কালো অন্ধকারে?

ছবি: প্রণব

আসল ভোটার

বসন্ত ভট্টাচার্য

দখিন পাড়ার হারুখুড়ো
একা থাকেন ঘরে
দরদালানটা ফাঁকা আছে
খুড়ি মরার পরে।
শনিবারের অমাবস্যায়
নেমে এলো খুড়ি
খুড়োর চক্ষু চড়কগাছ
গায়েতে সুড়সুড়ি।
আবার কেন এলে বলো
জ্বালাতে আমায়?
খনখনিয়ে উঠলো খুড়ি
জবাব দিতে তায়।
মরেছি বলে ভোট দেবো না
তা কখনো হয়!
আমার ভোট আমিই দেবো
প্রক্সি ভোট আর নয়।

তিন টুকরো

সুনীতি মুখোপাধ্যায়

হ্যাঁরে ভোলা, বলতে পারিস,
হয় কি করে বিস্ফোরণ?
ভোলা বলে, চার বার পাঁচ—
ফোড়ন দিলেই বিশ ফোড়ন।

গায়ে তো তোর ময়লা গাদা,
জামাটা তো পরিষ্কার,
সত্যি করে বল তো রাধু,
এই জামাটা পরিস কার?

ন্যাড়ার মাসিমা মাসে পাঁচ দিন
করছেন শুনি একাদশী,
তার জন্যে তো পাঁজি দোষী নয়,
বলা যায়, তিনি একা দোষী।